The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

শাক্ত পদাবলী ও *বৈষ্ণব পদাবলীর* সমাজতত্ত্ব : পঠন ও পাঠন

[Social Theory of *Shakta Padavali* and *Vaishnava Padavali*: Study and Teaching]

Goutom Goswami
Assistant Professor, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 02 March 2025
Received in revised: 24 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Middle ages, Vaishnav philosophy, Bhaktimarg, Shakta Padavali, Vaishnava Padavali, fifteenth century society, Sadhana Sangeet, lyric poetry

ABSTRACT

Two significant branches of the rich literary tradition of the Middle Ages comprises the *Shakta Padavali* and *Vaishnava Padavali*. The term "Shakta" emerged alongside the proliferation of the *Shakta* faith. The initial phase of *Vaishnava Padabali* predates the rise of *Vaishnavism*; these two forms of lyric poetry were initially performed as hymns by adherents of distinct philosophical traditions, a practice that persists to this day. The academic exploration of both *Vaishnava* and *Shakta* traditions is largely informed by this underlying ideology. Furthermore, the practical implications of these two literary categories have been observed. From this perspective, we can discern a unique significance in engaging with this literature. While the literature of the middle Ages may not have been as socially oriented as contemporary works, it remains intrinsically linked to societal contexts—no literature exists in isolation from the society that produces it. A thorough examination of the aforementioned texts necessitates an exploration of their social relevance. Analysing these works reveals fundamental compositional techniques and elements inherent in both literary categories. Our objective is to construct a comprehensive social narrative by synthesizing insights derived from an examination of the societal issues prevalent during that era. Given the chronological distinctions between these two literary forms, it is plausible that their social portrayals differ in practice. Accordingly, we will investigate the social dimensions of both *Vaishnava* and *Shakta Padabalis* and engage in a comparative analysis. Ultimately, this endeavour aims to illuminate a novel aspect of the social philosophy inherent in *Vaishnava* and *Shakta Padabali*. The essay will be structured to fulfil this objective.

১.১

সাহিত্য ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। সাহিত্যে সমাজ প্রতিফলিত হয় নান্দনিক পরিচর্যার মধ্য দিয়ে। সামাজিক তত্ত্বের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক বিষয় বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হয়; তবে এই প্রবন্ধে সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোকে দেখানো হয়নি। মধ্যযুগের বিশেষ দুটি ধারার সাহিত্যে সমাজ কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সামাজিক উপাদান সাহিত্যে নতুন কোনো প্রবণতা সৃষ্টি করেছে কি না– পঠনের মাধ্যমে এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করার ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব শব্দটিকে আশ্রয় করা হয়েছে। সমাজ-নিরীক্ষা আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম বিচার্য বিষয়। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যেও সামাজিক বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে দেখা গেছে। *চর্যাপদ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *মঙ্গলকাব্য*-এ তৎকালীন সমাজের নানা বিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে এবং এর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও বিদ্যমান। মধ্যযুগের সাহিত্য ধারায় বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীকে আমরা মূলত আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জীবনাশ্রয়ী সাহিত্য বলেই চিহ্নিত করি। কিন্তু ভিন্নদৃষ্টির পঠন-পাঠন ও পর্যালোচনায় এই দুই ধারার সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপাদান খুঁজে পাওয়া গেছে।

বাংলায় শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বৈদিক যুগের পর সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাকারবাদী ঈশ্বর সাধনার দৃঢ় প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেহেতু হিন্দু পুরাণে দেবদেবীরা নির্দিষ্ট অবয়বে আবির্ভূত, সেকারণে প্রযোজ্যক্ষেত্রে পুরাণ ধর্ম পালনের আশ্রয় হয়ে ওঠে। পদাবলী এই ধর্ম সাধনার অন্যতম প্রচার পদ্ধতি। তবে ভিন্ন দৃষ্টির বিশ্লেষণে এর সমাজগত দিকও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। 'খ্রিষ্টীয় স্নাদশ শতক থেকে বাংলাদেশে বিশেষ ধরনের কাব্য বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচলন শুরু হয়েছে। কবি জয়দেবই এ ধরনের পদাবলী রচনা করেন, তাঁর ধ্যান আধ্যাত্মিক ধারণা ছিল শ্রীকৃষ্ণের লীলা

আস্বাদন, তাই তিনি *গীতগোবিন্দ* কাব্য রচনা করেন।'[১] পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বভাগ পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী মূলত রাধাকৃষ্ণের মিলন-ভাবনাকে উৎসাহিত করেছিল। তবে সমাজ-ভাবনার প্রেক্ষাপটে পদাবলী পঠন-পাঠনের একটা বড়ো সুযোগ রয়েছে।

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)-এর আবির্ভাবের পর পদাবলী সাহিত্যের ভাবরূপ বিস্তৃত হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলার পাশাপাশি ঐ সময়ের পদাবলীতে চৈতন্যলীলা, চৈতন্য অন্তর্ধান ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের প্রতিকূলতার প্রত্যক্ষ চিত্র আমাদের সামনে আসে। হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তন এ সময়ের বিশেষ ঘটনা। ঐতিহাসিকদের পর্যালোচনায় অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে এ সময়ের অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দুরা ধর্ম পরিবর্তনের সিধান্ত নেয়– উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দীর্ঘদিনের ধর্মীয় পীড়ন এবং মুসলিম শাসকদের আগ্রাসী মনোভাব ও ধ্বংসযজ্ঞে ভীত হয়ে দ্রুত ধর্ম পরিবর্তন। 'মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে একশো বছরেরও বেশি সময় জুড়ে ইলিয়াস শাহী, মাহমুদ শাহী এবং হাবশি রাজত্ব চলেছে বাংলাদেশে। ইলিয়াস শাহী রাজাদের মধ্যে স্বয়ং ইলিয়াস শাহ তো বটেই এবং আরো দু-একজন– হয়তো বা রাজনৈতিক কারণেই যথেষ্ট হিন্দু বিরোধী ছিলেন।'[২] চৈতন্য জীবনীকার ও বৈষ্ণব পদকর্তা জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে এ সময়ে ব্রাহ্মণদের দেশ ত্যাগের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে আরও একটি তথ্য জয়ানন্দ উল্লেখ করেছেন 'লোকে বাদশাহের কানে গিয়া লাগায় যে, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তাঁহার রাজত্ব কাড়িয়া লইতে চাহেন।... অতএব তিনি যেন সাবধান হন। ইহারই ফলে রাজাজ্ঞায় নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ-ধ্বংসের আদেশ হয়।'[৩] এ সময়ে রচিত চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের সূত্রগুলো লক্ষ করি। এই সূত্রগুলোর বিস্তৃতি চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যেও লক্ষ করা যায়। শ্রী চৈতন্য তরুণ বয়সে টোল খুলে অধ্যাপনা করতেন। এ ধরনের টোলে সাধারণত ব্রাহ্মণদেরই ছাত্র হিসেবে দেখা যেতো। কিন্তু *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ শূদ্র শ্রেণিকেও টোলে শিক্ষা নিতে দেখা গেছে। অর্থাৎ ঐ সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শূদ্রের প্রবেশাধিকার ঘটেছিল :

কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর
তাঁর ঘরে রইলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥[৪]

তবে ব্রাহ্মণ-সমাজ এর প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। বৈষ্ণব-দর্শন প্রবর্তনে জাতিভেদ প্রথা লুপ্তকরণ ও শিক্ষার অধিকারকে সার্বজনীন করার প্রত্যয়েই শ্রী চৈতন্য এমন করে থাকতে পারেন বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক। বিয়ের খরচের তালিকা দেখে ঐ সময়ের উৎসব আয়োজন ও ব্যয় সম্পর্কিত একটি ধারণা পাওয়া যায় লোচন দাসের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে।[৫]

বৈষ্ণব সমাজে ঘটা করে বরযাত্রীকে আপ্যায়ন করার রীতি খুব একটা ছিল না। তবে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে বরের পালকিতে আরোহণের প্রথা ছিল। সেসময় 'গোড়ীয়া' বলা হতো বাঙালিদের। গোবিন্দ দাসের কড়চায় গৌড়ীয়া শব্দটির উল্লেখ আছে। আবার বাঙালি শব্দটিও গোবিন্দ দাস ব্যবহার করেছেন। তাঁর কড়চায় বাঙালি তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে গুজরাটে চৈতন্যদেবের সাক্ষাতের বিবরণ রয়েছে। ধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম থেকে আলাদা একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন। গোপালভট্ট ও সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব সমাজকে পরিচালিত করার জন্য *হরিভক্তিবিলাস* নামে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিগ্রন্থ। এখানে চৈতন্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে 'নিমানন্দী সম্প্রদায়' বলা হয়েছে।[৬]

১.২

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম ও দর্শন তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সামাজিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। চৈতন্য-জীবনীকাররা তাঁদের লেখনিতে গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রধান অভিযোগ ছিল চৈতন্যদেবের সনাতন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ। যে কৌলিন্য-ব্যবস্থা আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি যুগের পর যুগ আবর্তিত হয়েছে, চৈতন্যদেব তাকে বিলোপের প্রচেষ্টা করেছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ উল্লেখ আছে :

সন্ন্যাস্যী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ শূদ্র স্নারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।[৭]

চৈতন্যের জন্মের সময় ছুঁতমার্গ প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা একে টিকিয়ে রেখে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। অনেকক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়ের মানুষও এই প্রথায় আক্রান্ত হতো। *চৈতন্য ভাগবত*-এ এমনি একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে :

আয় নিমাই চাঙ্গাতি!
কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি?
কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন কুল, কেবা চিনে?
তার ভাত খাই জাতি রাখিবা কেমনে?[৮]

বালক বয়সে চৈতন্যদেব একবার বিপ্র-অতিথির[৯] প্রসাদ গ্রহণ করায় সমাজের নারীরা তাঁকে পরিহাস করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রধান অনুগত নিত্যানন্দও জাতিকুল পরিহার করে উদারনীতির জীবনপন্থাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি চৈতন্যভাবাদর্শের দীক্ষাকে আরও প্রসারিত করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় :

নিত্যানন্দের সর্ব কর্মই ব্রাহ্মণদের আচারের প্রতিকূল ছিল। অবধূত হইয়া সংসারে পুনঃপ্রবেশ করায়, তাঁহার "বান্তাসী" দোষ হইয়াছিল। তিনি জাতিগত স্পর্শদোষ মানিতেন না। তিনি সকলের বাড়িতেই খাইতেন– "হেন জাতি না খাইল যার ঘরে।" চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াও, ব্রাহ্মণের আচার রক্ষা করিয়া চলিতেন বলিয়া কথিত আছে। ... তাঁহার হাতে একটি দণ্ড থাকিত। ... ইহা দণ্ডীদের ব্রাহ্মণ্যভিমানের প্রতীক। চৈতন্যের দণ্ড যদি দণ্ডীদের ন্যায় হয়, তাহা হইলে নিত্যানন্দের স্নারা ইহা ভাঙিবার একটা বিশেষ অর্থ আছে। মনে হয় তিনি চৈতন্যের ব্রাহ্মণ-বংশের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ সর্ববিষয়ে সংস্কারক ছিলেন।[১০]

নিত্যানন্দের মহিমা উল্লেখ-পূর্বক রচিত বৈষ্ণবসাহিত্য রচিত হয়েছে, সেখানেও সমাজ-বীক্ষণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। রাধাকৃষ্ণ লীলার গীতিকবিতাই মূলধারার বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* পদাবলীরই ভাবাশ্রিত কাহিনিকাব্য– যেখানে পুরাতন প্রথাগত গ্রামীণ গোপ-পল্লির মানুষ ও সমাজের চিত্র দৃশ্যায়িত আছে। তবে বিবাহিত নারীর সঙ্গে পরপুরুষের সম্পর্ককে উপজীব্য করেই এ কাব্য। তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং ভাবোচ্ছ্বাস এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। পদাবলী সমাজতত্ত্ব নিয়ে শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন :

বৈষ্ণব পদাবলিতেও স্বামী আয়ান ঘোষ শাশুড়ি ও ননদ কুটিলা-জটিলাসহ সংসার-জীবনকে অস্বীকার করে রাধা পরপুরুষ কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং কৃষ্ণও রাধাতে। ধর্মের দিক থেকে কৃষ্ণ ভগবান এবং রাধা তাঁর শক্তি এইভাবে ব্যাখ্যা করে সেই প্রণয়কে শোধন করে নেবার চেষ্টা আছে। আমরা যারা সমাজতাত্ত্বিকতার দিক থেকে সমস্যাটিকে দেখতে চাই তাদের কাছে ওইরূপ ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিশেষ দাম নেই। সামাজিকভাবে দেখা যাচ্ছে এই তরুণ-তরুণীর প্রেম সমাজের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেছে। দাম্পত্য জীবনের যে মহিমা আদর্শায়িত হিন্দুর ভাবনায় তাকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। তখন আমরা এর মধ্যে একটি বিদ্রোহী শক্তির প্রকাশ লক্ষ করি। [১১]

রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও আন্তসম্পর্ককে মধ্যযুগের কবিরা উদার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। একদিকে তাঁরা এই প্রেমভাবনাকে রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত করেছিলেন, অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণ লীলাকে দেব মহিমায় উন্নীত করেছিলেন।

২.১

শাক্ত পদাবলীর আগমনী পর্যায়ের গানগুলোতে সমাজ এসেছে ভিন্নভাবে। সেসময় বিয়ের পর কন্যার বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসার সুযোগ ছিল একেবারেই কম; কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিয়ের পর মেয়েরা আর কখনোই বাবার বাড়িতে যেতে পারেনি। সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি করে উমার আগমনকে নিজ কন্যার আগমনরূপে প্রতিপন্ন করেছেন পদকর্তা রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) :

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়–
এবার মায়-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না॥[১২]

বিয়ের পর এদেশের মেয়েরা শ্বশুড়বাড়ির অধীন হয়ে যায়; বেশিরভাগ কাজ আপন ইচ্ছায় করতে পারে না। সেই আক্ষেপ তারা প্রকাশ করে স্বামীর কাছে :

বল গিরি এ দেহে কি প্রাণ রহে আর
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার।[১৩]

ঈশ্বরগুপ্তের এই পদে মেনকা হয়ে উঠেছেন বাঙালি মায়ের প্রতীক। মেয়ের জন্য তার এই উদ্বিগ্নতা যেন চিরায়ত বাঙালি মায়ের রূপকল্পকেই আমাদের সামনে হাজির করে। প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ে ঈশ্বরী পাটুনীর কথা; যিনি সন্তানের ভবিষৎকালের খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে ধন-রাজ্য-মান নয়, দেবীর কাছে চেয়েছিলেন 'দুধভাত'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সমাজে বাঙালি নারীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ঘরে ঘরে সপত্নী জ্বালায় তারা ছিল কণ্টকিত। উমার ঘরেও সতীনের যন্ত্রণা। সে কারণে চোখের জলে বুক ভিজিয়ে মেনকা বারবার কন্যাকে এনে দিতে অনুরোধ করেছে :

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ-শশী দেখ আসি, যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ-মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাব-ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরিবরে,
অমনি কাঁদে গলা ধরে॥[১৪]

পতি-পত্নীর দাম্পত্য কলহ, বিরহ-বেদনা, মান-অভিমান সন্তানের জন্য স্নেহ-ব্যাকুলতা সবই বাঙালির চিরায়ত আবেগ মথিত। এসব পদ রচনায় পারিবারিক আবহ যে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ কারণে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন শাক্ত পদাবলী মূলত পৌরাণিক জীবনের গার্হস্থ্য লীলা। আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালির গৃহ প্রাঙ্গনে নিয়ে যায় :

এই গানগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মনে ভেসে ওঠে, ছায়া সুশীতল ছোট ছোট পর্ণকুটিরগুলি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যত মেনকা কন্যার জন্য কেঁদে কেঁদে চোখের জলে গৃহপ্রাঙ্গণ ভাসিয়ে দিয়েছেন, তাদের অশ্রুপ্রবাহে রসসিক্ত এই গানগুলি– আগমনী ও বিজয়া গানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের গৃহধর্মের বাস্তবদিক উজ্জ্বল এবং সুপরিস্ফুট।[১৫]

২.২

অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বাংলায় ছিল রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছিল এই বিশৃঙ্খলার সূত্র। নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা (১৭৩৩-১৭৫৭)-র পতনের পর একদিকে রাষ্ট্রীয় সংকট যেমন ঘনীভূত হয়েছিল, অপরদিকে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, নীতিহীনতা, দৈববিশ্বাস নষ্টের উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হয়েছিল সমাজ-জীবন। এ অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করে রামপ্রসাদ লিখলেন :

মা গো তারা ও শঙ্করি
কোন্ অবিচারে আমার 'পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?
... ...
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি, তারে দিলে জমিদারী॥[১৬]

সার্বিক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করে কবি লিখেছেন এই পদ। আধ্যাত্মিক আবেশে লেখা হলেও কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারী নিলাম হওয়া ও কৃষ্ণপান্তির রাজা হওয়ার মাধ্যমে সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা ও আর্থিক দুর্নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় :

নিরুপায় অবস্থায় স্বয়ং শাক্ত কবিদের জীবনই হয়ে উঠেছিল বিপন্ন। ... এঁদের অনেকেই নবাবি আমলে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার ফলে ভাগ্যবিপর্যয়ের শিকার হন। বর্গীর হাঙ্গামা থেকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের করাল ক্ষুধার অভিজ্ঞতা, দেশের অন্তর্বিপ্লব ও মাৎস্যন্যায় তাঁদের জীবনকে করে তুলেছিল অস্থির ও বিভীষিকাময়। অনেকেই হয়েছিলেন সর্বস্বান্ত।[১৭]

পলাশীর যুদ্ধের পর (১৭৫৮-১৭৯৮) কলকাতার জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৭০,০০০০-এ; যা ১৭৫২ সালে ছিল ৪৯,০০০০। জনসংখ্যার দ্রুত পরিবর্তনের কারণ ছিল গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাব ও কর্মহীনতা। ১৭৬৮-র দিকে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষের প্রথম ধাপ, যা ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ঐসময়ে মাত্র ৩ মাসে কলকাতায় ৭৬,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল :

প্রায় এক বছর নিরবিচ্ছিন্ন চলে শতাব্দীর ভয়াবহতম এই দুর্ভিক্ষ। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ...দুর্ভিক্ষের সর্বগ্রাসী মারণ প্রভাবে তদানীন্তন বাংলাদেশের নদীয়া, বর্ধমান, যশোহর, খুলনা, বীরভূম, হুগলী, রাজশাহী, মালদহ, পূর্ণিয়া, রাজমহল ইত্যাদি অঞ্চলে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ এই মন্বন্তরের করাল প্রকোপে অনাহারে, পানীয় জলের অভাবে প্রাণত্যাগ করেছিল।[১৮]

যেহেতু সেসময়ের কবিরা এই বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, কাজেই তাঁদের রচনায় প্রকাশিত হয়েছে মন্বন্তরের প্রকৃতচিত্র। রামপ্রসাদের কিছু পদে সরাসরি এসেছে দুর্ভিক্ষের চিত্র :

মাগো আমার কপাল দোষী
(দোষী বটে গো আনন্দময়ী)
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারালাম বারাণসী
নইলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী [১৯]

একাদশী শব্দটি ব্যবহার করে খাদ্যাভাবের চিহ্নকে উন্মোচন করেছেন পদকার। অপর একটি পদে লক্ষ করি :

মা মা বলে আর ডাকব না
ও মা দিয়েছো দিতেছো কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্ন্যাসী, আর কী ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব, মা বলে আর কোলে যাব না। [২০]

রামপ্রসাদের এই পদে এসেছে ভিক্ষার প্রসঙ্গ– অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ মন্বন্তরে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করেছে। পদকার আরাধ্য দেবীর কাছে অভিযোগ করেছেন সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্যের। কৃষিভিত্তিক সমাজকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন

রামপ্রসাদ। খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ পীড়া দিয়েছিল তাঁকে। আত্মবেদনা থেকে লিখেছিলেন :

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥[২১]

ক্ষুধার সর্বগ্রাসী প্রকোপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শাক্তকবিগণ। তাঁদের আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিভাব পরাভূত হয়েছে জঠরের ক্ষুধার কাছে। নিরন্নের হাহাকার, সামাজিক বিপর্যয় এবং দেবতার অক্ষমতা এই কবিদের কিছু সময়ের জন্য হলেও দ্রোহী করে তুলেছিল :

এবার কালী তোমায় খাব,
খাব খাব গো দীন দয়াময়ি!
... .
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভরা দিব॥[২২]

ক্ষুধার পাশাপাশি দারিদ্র ও সামাজিক বিপর্যয়ের কথা এসেছে শাক্ত পদাবলীতে। সাধারণ বা নিত্যদিনের দৃশ্যপট পদকাররা কখনও রূপকার্থে গ্রহণ করেছেন, আবার কখনও রূপককে করেছেন ঐসব বিষয়ের অনুষঙ্গ :

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মতো?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥[২৩]

কলুর বলদের উপমায় সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা এখানে আছে। কাঠের ঘানিতে চোখ ঢাকা বলদকে বেঁধে কলুর নির্মম নিষ্পেষণের বর্ণনাটি মনে করুণা জাগায়। অপর একটি পদে রয়েছে সাংসারিক দুঃখকষ্টের একটানা বোঝা বহন করার ক্লান্তি। ঘামঝরা খেটে খাওয়া মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রতিযুগে প্রতিকালে একই সুরে ধ্বনিত হয়েছে 'আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই/ প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও, ক্ষণেক জিরাই।'[২৪]

৩.১

শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী বাংলার ভজন সংগীতের অন্যতম দুই ধারা। দর্শনগতভাবে শাক্ত ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় দর্শনের উদ্ভবগত সময়কালেও বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তবে প্রারম্ভিক সময়ের শাক্ত পদাবলী বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরস দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল :

আমরা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বহু-সংখ্যক শাক্তগীত পাইলাম। ইহাই বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া শাক্ত-পদাবলী নামে খ্যাত।

বৈষ্ণব-পদাবলীর সমগোত্রীয় বলিয়া শাক্ত-গানগুলির শাক্ত-পদাবলী নাম দেওয়া হইলেও বৈষ্ণব-পদাবলী এবং শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।[২৫]

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাথমিক পর্যায়ে রাধাকৃষ্ণের মিলনতত্ত্ব ও মধুররস-সঞ্জাত ছিল। জয়দেব (খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) ও বিদ্যাপতি (১৩৭৪-১৪৭৭) ভক্তিভাব অপেক্ষা সৌন্দর্য, প্রেম ও শৃঙ্গারকে প্রাধান্য দিয়ে পদ সৃষ্টি করেছেন। সে পদগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠকের মনোরঞ্জন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে ভক্তিবাদ প্রবলভাবে সংযোজিত হয়। কৃষ্ণ হয়ে ওঠেন পরমাত্মারূপ ভগবান, আর রাধা জীবাত্মা। এ পর্বে পদাবলীর দর্শন, কাব্য-উপাদান, ভাব-রূপ সবকিছুতেই পরিবর্তন আসে। চৈতন্যপূর্ব সময়ের পদাবলী যেহেতু শুধুই শ্রোতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত, তাই তাতে সমাজ-ভাবনা গুরুত্ব পায়নি। চৈতন্য যুগের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদগুলোতে সামাজিক প্রসঙ্গ না পাওয়া গেলেও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ও চৈতন্য-জীবনী সাহিত্যে সমাজ-ভাবনা লক্ষ করা যায়। পঞ্চদশ ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূত্রগুলো আমরা এ সময়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে খুঁজে পাই। এগুলো ইতিহাস রচনারও অন্যতম উৎস। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত পদাবলীর প্রচলন ও তাতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবের ফলে শাক্ত ধর্ম চর্চায়ও পরিবর্তন আসে। শক্তি সাধনার চরম ও কঠোররূপ অনেকটা নমনীয় হয়ে আসে এসময়কালে। তবে বৈষ্ণব পদাবলী যেমন বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ শাক্ত পদাবলী তেমন নয়। রামপ্রসাদ সেন এই ধারার শ্রেষ্ঠ শিল্পী; তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বেশিরভাগ শাক্ত পদকার পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় প্রথম থেকেই সামজ-ভাবনা গভীরভাবে প্রথিত। বাঙালি সমাজের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, ক্ষুধা, মন্বন্তর ও দারিদ্রের কথাও উঠে এসেছে এই

পদগুলোতে। উপর্যুক্ত দুই শ্রেণির পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনায় আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতে সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিরসের প্রাবল্য দেখি। পক্ষান্তরে শাক্ত পদাবলীতে ভক্ত ও ভগবানের আন্তসম্পর্কের আড়ালে খুঁজে পাই সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ঘটনা। শাক্তসাহিত্য বৈষ্ণবসাহিত্যের পরে রচিত– হয়তো সেটিও শাক্ত পদাবলীকে কিছুটা সমাজ-ঘনিষ্ঠ করেছে। উভয় শ্রেণির সাহিত্য পর্যবেক্ষণ শেষে মধ্যযুগের সাহিত্যের নান্দনিকতার পাশাপাশি সমাজ ও রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ পাঠ আমাদের সচকিত ও সমৃদ্ধ করে বলেই সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ শামসুল আলম সাঈদ, 'বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস ও ক্রমবিকাশ', *পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৫

২ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *চৈতন্যদেব*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২৫ [প্রথম প্রকাশ : ২০১২], পৃ. ১৪৮

৩ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব', গৌতম অধিকারী (সম্পা.) *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৫ [প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৫], পৃ. ২৮

৪ উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ৩০

৫ তদেব, পৃ. ৩১

৬ তদেব, পৃ. ৩১-৩৩

৭ উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ৩৪

৮ উদ্ধৃত, তদেব

৯ 'বিপ্র' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ বা দ্বিজত্তম। চৈতন্য সমকালে ছুঁতমার্গ এতোই প্রবল ছিল যে অপরিচিত ব্রাহ্মণ ব্যক্তির আহারান্তে প্রসাদ খেলেও জাত খোয়ানোর সম্ভাবনা ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও উঁচু ও নিচু গোত্র ছিল। গোত্র না জেনে ব্রাহ্মণ নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের প্রসাদ গ্রহণ করতো না। এমন অচেনা অতিথির প্রসাদ গ্রহণ করলে জাত যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

১০ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

১১ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পদসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব', *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৯০

১২ মুহম্মদ আবদুল হাই ডক্টর আহমদ শরীফ (সম্পা.), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪ [প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৯], পৃ. ২০৩-২০৪

১৩ ড. মোহন পাল (সম্পা.), 'শাক্ত পদাবলীতে জীবনরস', *শাক্ত পদাবলী*, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২৮ [প্রথম প্রকাশ : ১৪১৫], পৃ. ৫৭

১৪ তদেব, পৃ. ২২২

১৫ তদেব, পৃ. ৬৩

১৬ তদেব, পৃ. ২৯৩

১৭ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'শাক্তপদ ও সমাজ জীবন', *শাক্ত পদাবলীর সমাজ-তত্ত্ব-শিল্পরূপ*, সোম পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৯৩

১৮ সুপ্রতীপ দেবদাস, *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং রামপ্রসাদের গানে তার উদ্ভাস*, কলকাতা প্রেস বুকস, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ২৫-২৬

১৯ তদেব, পৃ. ৪০

২০ তদেব

২১ মুহম্মদ আবদুল হাই ডক্টর আহমদ শরীফ (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

২২ তদেব, পৃ. ২২৮

২৩ ড. মোহন পাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

২৪ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

২৫ শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'বাঙলা শাক্ত-সাহিত্য', *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্তসাহিত্য*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৪১৬ [প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭], পৃ. ২০৬